পলল তটভূমি

অরুন্ধতী ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় অংশ

।। উনিশ।

বিজয়া দশমীর প্রণাম করতে অনেকেই এসেছে বাড়িতে। এই জোর করে ধরে রাখা প্রাণহীণ রীতিগুলো এখন আর ভালো লাগে না পালকের। ছোটো বেলার আনন্দগুলো কেমন করে যেন হারিয়ে যায়। পালকের এখন মনে হয় এরা আসে শুধু কার শাড়ি কত দামি, কার পোষাক কোন ব্র্যান্ডের সেই আলোচনায় নিজেদের স্ট্যাটাসটা বুঝিয়ে দিতে। ল্যান্ড কোনটা বাজছে। আবার প্রণামীর ফোন! মা অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত, বাবা বড়ো পিসির বাড়ি গেছে, আজ ফিরবে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফোনটা পালকই ধরল, ওপাশ থেকে কনিষ্কের গলা ভেসে উঠল,

—হ্যালো পালক? কেমন আছিস?

—ভালো।

—বিজয়ার শুভেচ্ছা নিস।

—নিলাম। মাকে দিচ্ছি।

—দিবিতো বটেই! এত তাড়া কীসের?

—দিদি কোথায়?

—ও শুয়ে আছে? আমার সঙ্গে সত্যি আর কথা বলবি না রে?

—কেন বলত? দিদির কিছু প্রব্লেম হয়েছে?

—তা একটু হচ্ছে! পাখি কনসিভ করেছে পালক! এই আনন্দটা অন্তত:সবার সঙ্গে ভাগ করে নে।

—আনন্দের খবরে আনন্দই হয়। মা আসছে, কথা বলো।

সুন্দর পরিপাটি একটা ঘর। সুপরিকল্পিত দিন যাপন। স্বাচ্ছন্দ্য। যথাসময়ে সন্তান সম্ভবা হওয়া —দিদি সবটাই পেয়েছে। এটা ভালো লাগারই কথা। তবু স্বার্থপর মনটা কিছুতেই ভালো থাকতে চাইছে না। পালকের একদম ভালো লাগছিলনা। আত্মীয় স্বজনদের মাঝে দেঁতো হাসি হেসে ভদ্রতা করতে করতে বিরক্তি বেড়েই চলেছিল। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ সবাই বিদায় হলো। চিত্রা বিকেলে ফোন করেছিল, ওদের বাড়িতে যেতে ফিস্ট করবে। পালকই রাজি হয়নি। মা একহাতে সব সামলাতে পারবেনা। এখন মনে হচ্ছিল চিত্রার কাছে চলে গেলেই হতো! পালক নিজের ঘরে ঢুকেছিল একটু একা থাকার জন্য। ঢুকেই দেখল ওর খাটের পাশে তানপুরাটা রাখা। নিশ্চয়ই মার কাজ! সে এগুলো থেকে দূরে যেতে চায়— অনেক দূরে! তবু এদের জন্য পারছেনা। এরা তো বোঝে না, এই সব কিছুকে কী মহার্ঘ্য করে তুলেছিল কনিষ্ক! আর কনিষ্কই এগুলোর দাহকার্য করে গেছে। শুধু অশরীরী বোধ নিয়ে অনুষঙ্গ গুলো রয়ে গেছে। পালক নীচে নেমে এল। মাকে সরাসরি প্রশ্ন করল,

—তুমি তানপুরাটা বার করেছ কেন?

—ধুলো পড়েছিল, পরিষ্কার করছিলাম। তখনই তো তোর ছোটোপিসি, সেজমাসিরা এসে পড়ল!

—এবার থেকে ওগুলো তোমার ঘরেই রেখ মা!

—ওগুলো মানে?

—তানপুরা, হারমোনিয়াম -সব! আমার ঘরটাকে আর জঞ্জালে ভরিও না।

—কীসের কথা বলছিল? া বললে জানব কী করে?

—আমি কেমন করে জানতে পারলাম মা, তোমার বড়ো মেয়ে কী ভাবে ভালো থাকবে? তোমরা কীভাবে ভালো থাকবে? ইচ্ছে করলে জানা যায় না! অন্তত তোমার জানাটা উচিত চিল!

—তোর কী হয়েছে বলত? এভাবে কথা বলছিস।

—কিছু হলেও তোমাদের চিন্তার কারণ হবো না মা!

—তুই তো কখনও চিন্তার কারন হোসনিরে সোনা!

—সেটাই তোমাদের বোধহয় ভুলিয়ে দিয়েছে যে আমি একটা মানুষ! আমি চিত্রার বাড়ি যাচ্ছি।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে পড়ল পালক। মাঝের গলিটা পার হবার সময়ই লোডশোডিংটা

হলো। অন্ধকার রাস্তায় সাবধানে হাঁটার প্রয়োজনটাও বোধ করছিলনা ও। ফল অবশ্যম্ভাবী— একটা গর্তে পাড়ে চোট পেয়েছে। হাঁটু মুখ কোনোটাই অক্ষত নেই। সালোয়ার ছিঁড়ে হাঁটু থেকে রক্ত পড়ছে। মাথাটা বেঁচে গেলেও ঠোঁটের কষ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। বাঁ কনুইটা মুচকেছে বোধহয়। ভীষণ জ্বালা আর যন্ত্রনা তার শরীরে আর মনে। এরমধ্যেও উঠে দাঁড়ানোর আপ্রাণচেষ্টা করছিল পালক। শরীরের কষ্টটা মনের কাছে মাঝে মাঝে কত তুচ্ছ হয়ে যায়। তবু বাড়ি ফিরল না ও। মোড়ের মাথায় চিত্রাদের বাড়িটা। একটু নি:শ্বাস নেবার জন্য সেখানে আজ পৌঁছতেই হবে ওকে। কৃষ্ণেন্দুদার দোকানের হেল্পার গোলাপ ওকে দেখে প্রায় আঁতকে উঠল,

—কী ভাবে হোল পালকদি?

—পড়ে গিয়েছিলাম।

—দাঁড়াও।

গোপালই ধরে ধরে ওকে দোতলায় নিয়ে এল। ভাবল বুঝি, সম্বিতদার কাছে ফার্স্ট এইড করাতে এসেছে পালক। ভালোই হলো এক দিক দিয়ে। পালককে দেখে চিত্রা ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল,

—কীভাবে হলো? অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে না কি?

চিত্রার গলায় সম্বিতদা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কাকু-কাকিমারা দেশের বাড়ি গেছেন, আজ ওঁরাও ফিরবেন না। অভিভাবকরা কেউই নেই। প্রভামাসি তাঁর বরকে নিয়ে বাপের বাড়ি গেছে আজ বিকেলে। একারনেই বোধহয় ফিস্টের আয়োজন করছিল চিত্রা। কিন্তু পালকের অবস্থা দেখে চিত্রা অন্য আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জল গরম করা ডেটল, তুলো, টিঞ্চার আয়োডিন, ব্যান্ডেজ এমন কী চুন - হলুদ গরম করা পর্যন্ত বাদ রাখল না। ওকে দেখে হয়ত বোঝা যায় না, কিন্তু পালক জানে চিত্রার মধ্যে একটা অদ্ভুত মাতৃত্ব আছে। চিত্রা ওকে ধরে ধরে পোষাক পাল্টিয়ে নিজের খাটে শুইয়ে দিল। যন্ত্রনায় অসাড় হয়ে আসছিল পালকের শরীর। কাঁপুনি দিচ্ছিল। সম্বিতদা ড্রেসিং করে একটা এটি.এস.ইনজেক্শান দিল। বাঁপায়ের গোড়ালিটা বিকটরকম ফুলেছে। ওখানে আল্তো হাত দিতেই দাঁতে দাঁত চাপল পালক। খুব ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে সম্বিতদা বলল,

—তোর পা মচকায়নি।

—বিধ্বস্ত পালক একটু হাসার চেষ্টা করল, বলল,

—তাহলে তো নিশ্চিন্ত।

—বেশি ভালোরকম নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস। পাটা ভেঙেছে। সোয়েলিংটা একটু না কমলে এক্সরে করেও লাভ নেই। লিগামেন্টও ছিঁড়েছে বলেই মনে হচ্ছে। কনুইয়ে হেয়ার ব্ল্যাক থাকতে পারে। ভোগাবেরে পালক। দেখি দেবাশিসকে একটা ফোন করে। আজ তো আসতে পারবে না।

সম্বিতদা মোবাইলে নম্বর ডায়াল করতে করতে বেরিয়ে গেল। এই হট্টগোলেও শাক্যর মুখটা নজর এড়ালোনা পালকের। কেন যে ছেলেটা অসময়ে আসে? বার বার আসে! আগে তো এত কোইন্সিডেন্স হতো না! দিদির বিয়ের বছর থেকেই যেন ব্যাপারটা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এখানেও কারেন্ট নেই। ইনভার্টারের কারসাজিতে যদিও সেটা বোঝা যাচ্ছে না। পালক বুঝতে পারছিল ওর জ্বর আসছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছে। তন্দ্রার মধ্যে মাঝে মাঝে ডুবে যাচ্ছিল পালক। তন্দ্রার এই অর্ধজাগরণের মধ্যেই ও শুনতে পেল সম্বিতদা বলছে,

—পেইন কিলার দিয়েছি। প্যারাসিটামলও দিতে হবে। টেম্পারেচারটা ভালোই রয়েছে। একটু কিছু খেয়ে প্যারাসিটামলটা খাওয়া ভালো।

চিত্রা বলল,

—একটু গরম দুধ দিই দাদা?

—দে।

চিত্রা কিছুক্ষণের মধ্যেই এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে এসে বলল,

—এটা খেয়ে নে পালক। না হলে খুব উইক হয়ে পড়বি;

—তোরা খাবি না?

—ফিস্টটা মাটি করলাম, নারে?

—দুধটা খা।

—বকছিস কেন?

—বকার মতো কাজ করলে বকা খেতেই হয়। দাদা বাড়িতে না থকালে তোকে নিয়ে যে কী করতাম?
—যা করছিস, তাতেই ঠিক হয়ে যেতাম।

পালক বাধ্য ছাত্রীর মতো দুধটা খেয়ে ওষুধটা খেল। চিত্রাই খাইয়ে দিল। তার শরীর মন সবই কেমন যেন অচেনা লাগছে। চিত্রা বোধহয় রান্না ঘরে গেল। কারেন্ট এসে গেছে। চিত্রার ঘরের ব্যালকনি থেকে দুজন মানুষের কথা ভেসে আসছিল। একজন সম্বিতদা, আর একজন শাক্য। পালক স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল সম্বিতদা বলছে,

—তোর বাড়ি চিনতে অসুবিধে হয়নিতো? যদিও আমি কাকিমাকে ফোন করে দিয়েছিলাম। তবুও বাড়িতে গিয়ে বলাটা উচিত বলেই মনে হলো।
—হ্যাঁ। আমি উনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম উনি আসবেন কি না?
—সেটার দরকার খুব একটা নেই। তবে দুশ্চিন্তাটা থেকেই যাবে।
—উনি বললেন,'সম্বিত চিত্রা তোমরা সবাই রয়েছ।' তাছাড়া ওর বাবা বোধহয় আজ বাড়ি ফিরবেন না।
—সেটা কোনো ম্যাটার করে না। কাকিমার কাছে নিশ্চয়ই বাড়ির থেকে মেয়ের প্রায়োরিটি আগে। তাছাড়া মাকে কাছে দেখলে পালকটারও ভালো লাগত!
—ও বোধহয় এটাতেই বেশি কমফর্টেব্‌ল্‌ ফিল করছে। ওর মাও বোধহয় আন্দাজ করেন সেটা। বাড়ির প্রয়োরিটি নয়, মেয়ের প্রায়োরিটির জন্যই বোধহয় আসবেন না!
—কী করে বুঝলি?
—ওর মার ব্যাপারটা বলতে পারব না।
—আর পালকেরটা?
—সিম্পল্‌। ততটা ইনজিওর্ড হয়েও যখন বাড়ি না গিয়ে এখানে এসেছে, তারমানে ওর কাছে বাড়ির থেকেও এখানে আসাটা বেশি দরকার ছিল! বাড়ির সঙ্গে বোধহয় একটা দূরত্ব রাখতে চাইছে!
—তুই সাইকিয়াটিস্ট হলে পারতিস! পায়ের ইনজুরিটা সিরিয়াস। মেয়েটা কষ্ট পাবে।
—খুব সিরিয়াস কিছু দেখলে? অপারেশানাল কেস না কি?
—না, অপারেশানাল নয়, তবে বেশ সিরিয়াস। এই অবস্থায় পালক এই বাড়ি পর্যন্ত কীভাবে এল সেটাই ভাবছি। যা পেইন হচ্ছে অন্য কেউ হলে চিৎকারে বাড়ি মাথায় চুলত! অথচ এই মেয়েটা একবারও চিৎকার করল না, আশ্চর্য!
—হয়ত চিৎকার করার মতো ইনজুরি এটানয়!
—তোর মতো অবজাবর্ভার থাকলে ডাক্তারদের খুব সুবিধে!
—হয়ত তোর ঠিকই মনে হয়েছে। এটা কি তোর প্রথমবার মনে হলো?
—কী?
—এত ডিটেলে অবজার্ভ করাটা?
—বোধহয়। একচুয়ালি এরকম পরিস্থিতিতে আগে পড়িনি! পড়লে হয়ত আরও ভালো অবজার্ভ করতে পারতাম।
—কৃষ্ণেন্দু বিকেলে কোথায় বেরিয়ে গেলরে?
—টাকিতে। কী একটা ফোন এল, বেরিয়ে পড়ল। বলেছে কাল বিকেলে ফিরবে।

পালক সব শুনতে পাচ্ছিল। এই ছেলেটা তার কোনো কথাই জানে না। তবু সবচেয়ে ঠিক কথাটা বলে দিল। পালকের ভয় করছিল। এরকম অচেনা ভয় তার আগে কখনও লাগেনি। সম্বিতদারা ব্যালকনি থেকে ঘরে ঢুকেছে। চিত্রা হাতে থার্মোমিটার নিয়ে ঢুকল। সম্বিতদা জিজ্ঞেস করল,

—এখন কেমন ফিল করছিল পালক?
—ঠিক আছি।
—সে তো বুঝতেই পারছিস।

চিত্রা ততক্ষণে ওর মুখে থার্মোমিটার গুঁজে দিয়েছে। ঘড়ি ধরে টেম্পারেচার নিচ্ছে। থার্মোমিটারের রিডিং দেখে চিত্রা শুকনো মুখে বলল,

—দাদা, প্যারাসিটামল দিয়েও তো একশ দুই!
—অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছি। ঘন্টা খানেক পরে আরও দুটো ওষুধ খেতে হবে। তবে শুধু এক গ্লাস দুধ খেয়ে

অ্যান্টি বায়োটিকের ধার সামলাতে পারবে না। আরেকটু কিছু খেতে হবে যে পালক।
—পালক অসহায়ের মতো বলল,
—একদম ইচ্ছে করছে না। তোমরা বরং খেয়ে নাও।
—সে তো খাবই। কিন্তু ওষুধটা যে তোকে খেতে হবে। তাই ইচ্ছে না করলেও অল্প হলেও একটু ফুড ইনটেক করা দরকার।

চিত্রা ধমকে উঠল,
—পালক পাকামি করবি না। আমি এক্ষুনি একটা দারুন জিনিস বানিয়েছি তোর জন্য!
—কী রে? পোলাও?
—প্রায় সেরকমই। তবে মেডিকেটেড।
—জঘন্য!
—খেয়ে দ্যাখ, খারাপ লাগবে না।

সম্বিতদা টেম্পারেচার চার্টটা দেখছিল। চিত্রা ততক্ষণে পালককে ওর মেডিকেটেড খিছুড়ি গোছের কী একটা খাইয়ে দিয়েছে। সম্বিতদা বলল,
—টেম্পারেচারটা এক ঘন্টা অন্তর দেখতে হবে। চিত্রা তো রান্নায় ব্যস্ত। শাক্য, তুই এই দায়িত্বটা নে। আমি ওষুধ দুটো দেখছি।

ওরা আরও কী কী যেন বলছিল, পালক তন্দ্রার মধ্যে দিয়ে কোথায় যেন ডুবে যেতে লাগল। ঘুম যখন ভাঙল, তখন শরীরটা যেন আগের থেকেও বেশি কাহিল মনে হচ্ছিল। ঘরে একটি মাত্র মানুষ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। এই ছেলেটাই এতক্ষণ ওকে পাহারা দিচ্ছিল নাকি? উফ্ আর পারা যায় না। কেন যে এরকম হয়। পালকের খুব তেষ্টা পাচ্ছিল। পাশে টুলে রাখা জলের গ্লাসটা নেবার চেষ্টা করছিল ও। শাক্য তখনই ঘুরে তাকাল। জিজ্ঞেস করল,
—জল খাবে?
—হ্যাঁ।
—দুটো ওষুধও খেতে হবে যে। নিজে খেতে পারবে?
—পারব বোধহয়।

পালক একটু উঠে জলের গ্লাসটা নেবার চষ্টো করছিল। পারল না। ও বুঝতে পারছিল ও আর পারবে না। পারছে না। শাক্য ওর মাথাটা সামান্য তুলে ওষুধ দুটো খাইয়ে দিল। পালক এর থেকে অস্বস্তিকর অবস্থায় অগে পড়েছে বলে ওর মনে হলো না। কী বলবে? কী করবে? কিছুই ও বুঝে পাচ্ছিল না। শাক্য বলল,
—জানি অস্বস্তি লাগছে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একজন অসুস্থ মানুষের কাছে কে তাকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে সেটাই ইমপটেন্ট নয়।

এই ছেলেটা বড্ড বেশি বুঝে ফেলে। অংক সাবজেক্টটা কী এতে সাহায্য করে? তাহলে তো পালকের কোনো সুযোগই নেই। ওই বিষয়টায় চিরকালই ভীতিপ্রদ ছিল ওর কাছে। শাক্য আবার জানলার কাছটায় ফিরে গেছে, পালক একটু আড়ষ্ঠ হয়েই বললো,
—আর একটা ফেবার করবেন?

শাক্য জানলা থেকে সরে এসে, একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল,
—কী?
—মাকে একবার জানিয়ে দিলে ভালো হয়, যে আমি ভালো আছি। ভীষণ দুশ্চিন্তা করছে।
—এত রাতে ফোন করাটা কি ঠিক হবে? তাতে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে।
—না না, মা একটু নিশ্চিন্ত হতে পারবে। আমি জানি, মা এখনও জেগে আছে।
—আমি যে মিথ্যে কথা বলতে পারব না!
—মিথ্যে কথা?
—হ্যাঁ, কারণ তুমি অনেকটা নয়, একটুও ভালো নেই!
—আশ্চর্য আমি বুঝব না আমি কেন আছি!
—নিশ্চয়ই বুঝছ। কিন্তু বোঝাচ্ছ অন্যরকম।
—আমি সত্যিই বোঝাচ্ছি, যেটা আমি ফিল করছি!

—তাই? তাহলে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছিলে কেন?

পালক চমকে উঠল! সে প্রলাপ বকেছে? এরকম তো তার কখনও হয়নি। কী বলেছে সে? এমন কিছু বলে ফেলেনি তো যাতে...

শাক্য খুব শান্তভাবে বলল,

—টেনশানের কোনো কারন নেই। ঘরে সেসময় আমি একাই ছিলাম। আমি কাউকে কিছু বলবনা। তাছাড়া প্রলাপ তো আর আলাপ নয়, বিশুদ্ধ অর্থেই প্রলাপ!

পালক অধৈর্য হয়ে বলল,

—কী বলেছি আমি?

—শুনতেই হবে।

—হ্যাঁ।

—গালাগাল করোনি কাউকে!

—আমাকে সত্যি কথাটা বলতে কি খুব অসুবিধে আছে?

—বলেছ, ''এবার পুজোয় হাঁসজারু কিনেছি!''

—আর?

—আর বলেছ, 'পান্তভূত্যের জ্যান্ত ছানাটা আমায় শান্ত করে দেয়।''

—আর?

...আর, 'তানপুরা আর মুণ্ডার একই জিনিস!''

পালক খুব শান্ত গলায় বলল,

—কথাগুলো বিশ্বাস করার মতো এতটা বোকা আমি নই! প্রলাপ বকার সময় অফেন্সিভ কিছু বলে থাকলে, আই অ্যাম সরি!

—কেন সরি কেন?

—হয়ত এমন কিছু বলেছি যাতে খারাপ লাগার মতো কিছু থাকতে পারে।

—আমার খারাপ লাগার মতো কিছু বলোনি!

।। কুড়ি।।

এমন অনেক ঘটনা ঘটে যায় যার কার্যকারণ সম্পর্ক আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ে না। আর তখনই ব্যাপারটা ভীষণ গোলমাল করতে থাকে। শাক্য বুঝতে পারছে এই গোলমেলে ব্যাপারটায় সে কিছুতেই সুস্থির থাকতে পারছে না। একটা অস্বস্তি মনের আনাচে কানাচে ঘুরপাক খাচ্ছে। সেটা বেশ কিছুদিন ধরেই হচ্ছে। কিন্তু গত সপ্তাহের ঘটনাটা ছিল চূড়ান্ত। এক ধাক্কায় সেটাকে যেন কয়েকগুন বাড়িয়ো দিয়েছে পালক। ছোটো যখন ছিল তখন হয়ত এক আধটা কথা হয়েছে পালকের সঙ্গে। কেমন আছ? —ভালো' —গোছের কুশলবার্তা। বড়ো হবার পর কোনো এক অজ্ঞাত কারণে মেয়েটাকে বহুবার চিত্রাদের ওখানে দেখলেও তেমন কোনো কথাই হয়নি। খুব বেশি হলে একটা সৌজন্যের হাসি। এরকম নির্বাক শাক্য খুব বেশি বোধহয় দেখা যায় না। হয়ত তারা কেউই কথা বলার মতো কিছু পায়নি, দরকার বোধ করেনি, মানসিকতাও তৈরি হয়নি। মাধ্যমিকের পর অবশ্য বেশ কয়েকটা বছর শাক্য কলকাতার বাইরে ছিল। দিল্লীতে মামার বাড়িতে থেকে তখন পড়াশোনা করত। বড়ো মামা অনেক অনুরোধ করে বাবকে রাজি করাতে পেরেছিলেন। পেশাগত দিক থেকে মিল থাকার জন্য নয়, বড়োমামাকে বাবা পেশ পছন্দ করতেন। এম এস সি শেষ করে সবে পি.এইচ.ডি শুরু করেছে শাক্য। ততদিনে বড়োমামা মারা গেছেনে। মামার বাড়ির চেহারাটাও দ্রুত বদলাতে শুরু করেছে। তখনই বাবার শরীরও প্রথম জেহাদ ঘোষণা করল। দাদার বিদেশিনী সংবাদ, বড়দির বিয়ে সবমিলিয়ে কুন্তল সেন আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন, অন্যমনস্কতায় ঘটে গেল ভয়ঙ্কর অ্যাক্সিডেন্ট। মাথায় চোট পেয়ে শিরের বাঁ দিকটা অসাড় হয়ে গেল। শাক্য আর দেরি করেনি, ফিরে আসে কলকাতায়, বাবার কাছে। একদম পাকাপাকি ভাবে সিদ্ধান্ত নেয় সে এখানেই থাকবে। ফিঝিওথেরাপি ও কউড় অংকেলের জন্য বাবার শরীর সুস্থ হয়ে উঠছিল। তবে লাঠি ছাড়া আর হাঁটতে পারবে না। হাঁটলেও খুব কম শাক্যর সিদ্ধান্তে বাবা বিরক্তই হয়েছিলেন। বলেছিলেন,

—পি. এইচ. ডি টা কমপ্লিট করে আসা উচিত ছিল।

—সে তো এখানে থেকেও হয় বাবা!

—কিন্তু একটা ব্রাইট ফিউচার ছিল ওখানে।। পরে আক্ষেপ করবি।

শাক্য বুঝেছিল, মুখে বিরক্তির প্রকাশটা আসলে বড়ো পুত্র কন্যার ওপর চূড়ান্ত অভিমান। বোধহয় শাক্য সম্পর্কেও দ্বিধা ছিল। শাক্য খুব জোর দিয়েই বলেছিল,

—আমার আক্ষেপ হবে না বাবা। বরং এখানে না থাকলেই নিজেকে দোষী মনে হবে!

শাক্য থেকে গেছে। আরও ভেতরে ঢুকে গেছে। রিসার্চ এর জন্য বিদেশ বিভুঁই নয়, এস. এস. সি পরীক্ষা দিয়ে। তার পোস্টিং ক্যানিং এ শুনে বাবা আর মধুরাদিরা ছাড়া সবাই ভেবেছিল শাক্য জয়েন করবে না! আর করলেও কয়েকদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে। উঠতি বয়সে বহু ছেলে মেয়েই এরকম দেশপ্রেমী হয়ে ওঠে! শাক্য ওর সিদ্ধান্ত বদলায়নি। বদলানর কারণ বা ইচ্ছে কোনোটাই সে বোধ করেনি। শুধু বাবাকে নিয়ে চিন্তাটা রয়ে গিয়েছিল। বাবা তাকে সমর্থন করেছিলেন। সবচেয়ে বেশি ইনফুয়েন্সড্ হয়েছিল ও সম্বিতদার কথায়,

—বিদেশে অনেক শাক্য আছে, যাবেও। অথচ এখানে দরকার আছে কিন্তু শাক্যরা নেই! তুই খুব ভালো ডিসিশান নিয়েছিস। মেসোমশাইয়ের জন্য চিন্তা করিসনা। আমরা তো আছি। তাছাড়া ক্যানিং এমন কিছু দূর নয়। শনিবার করে চলে আসবি। তাছাড়াও প্রচুর ছুটি পাবে।

বেশ ছিল শাক্য। কিন্তু গতবছর থেকেই তার অস্বস্তিটা বেশ ঝামেলায় ফেলে দিল। একটা মানুষ খুব ধীরে ধীরে বদলালে পরিবর্তনটা খুব কাছ থেকে না দেখালে বোঝা যায় না। তাই পালকের পরিবর্তনটাও সে লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ করে একদিন যেন ও আবিষ্কার করল, পালক বদলে গেছে। আগে ছুটি ছাটায় যখনই সে ছোটোমামার কাছে গেছে, বেশিরভাগ সময়ই কাটিয়েছে পাড়ার ক্রিকেটে অথবা কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে আড্ডা মেরে। দেখেছে মেয়েটা হাসছে। কারণে অকারণে হেসেই চলেছে। সেসময় অবশ্য ও বুঝতে পারেনি পালক এত হাসে কেন? কখনও মনে হত মেয়েটারহ মাথায় ছিট আছে। পালক এখনও হাসে। কিন্তু শাক্যর কেন যেন মনে হয় মেয়েটার হাসিটা একটা বর্ম্য অন্তত আনন্দের হাসি এটা নয়। গতবার গ্রীষ্মের ছুটিতে সম্বিতদার ঘরেই আড্ডা জমেছিল। চিত্রা আর পালকও ছিল। কৃষ্ণেন্দু তর্ক তুলল রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে। ওরা যে যার মতো যুক্তি দিচ্ছিল। এসবকিছুর মধ্যেও শাক্য লক্ষ্য করেছিল পালকের মুখের হসিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কেমন যেন একটা অদ্ভুত অস্থিরতা দেখতে পেয়েছিল ও পালকের মধ্যে। কৃষ্ণেন্দু বলল,

—এই যে পালক, তুই তো রবীন্দ্রসংগীত স্পেশালিস্ট। তাহলে এমন হাল ছেড়ে বসে, আছিস কেন? একটা খাসা গানধরে এদের বুঝিয়ে দেতো, যে আমার কথাটাই ঠিক!

—আজ এক্ষুনি উঠতে হবে গো। একটা কাজ আছে। পরে না হয় আরেকদিন শোনাব।

পালক কাউকেই কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেছিল সেদিন। ঘটনাটায় সম্বিতদা আর চিত্রা একবারও বাধা দিল না। কিছু বললও না! অথচ আগে শাক্য দেখেছে, পালক কথার উত্তর দিত গান গেয়ে — সব রবীন্দ্রসংগীত। মেয়েটা যেন গোটা গীতবিতানকেই মনে মিশিয়ে রেখেছে। শাক্যর কাছে লুকিয়ে রেকর্ড করা পালকের গলার একটা গান এখনও আছে। কৃষ্ণেন্দু ওই ক্যাসেটটার নামটা দেখেই অবাক হয়েছিল। ওর আর কোনো ক্যাসেটের ওপরে রবীন্দ্রসংগীতের লাইন লেখা নেই। গানটা যেদিন ও রেকর্ড করেছিল সেদিনও লোডশোডিং ছিল। ও সম্বিতদার ঘরে বসেছিল। সম্বিতদা তখনও ফেরেনি। হঠাৎই পাশে চিত্রার ঘর থেকে গানটা ভেসে এসেছিল,

—আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে...

শাক্য সম্মোহিতের মতো উঠে গিয়ে চিত্রার ঘরের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে শুনেছিল গানটা, তার রেকর্ডার অন করে। সেই পালককে সেদিনের পর আর গাইতে শোনেনি ও। প্রথমে খেয়াল করেনি, কিন্তু দুবছর আগের গ্রীষ্মের ছুটির ওই ঘটনাটাতে ওর প্রথম খটকা লাগে। বার বার ফ্ল্যাশ ব্যাকে গিয়েও দেখেছে শাক্য, ছবিটা মিলছেনা। ও কৃষ্ণেন্দুকে পাখির বিয়ের ছবির ব্যাপারে হেয়ালি করেছিল। আসলে হেয়ালিটা তৈরি হয়েছিল পাখির পাশে বসা পালকের ছবিটা দেখে। প্রথমেই মনে হয়েছিল পালকের এত বিষন্ন মুখ সে আগে কখনও দেখেনি। দিদি শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে বলে দুঃখে কাতর হওয়া মেলোড্রামাটিক এক্সপ্রেশান ওটা নয়। মেয়েটার চোখ দুটো, আরও গভীর কিছু বলছিল। গত সপ্তহের সেই রাত্রে কয়েকটা মুহূর্ত হেঁয়ালিটাকে আরও জটিল করে তুলেছে। পালক জ্বরের ঘোরে সত্যিই প্রলাপ বকছিল। সম্বিতদা, চিত্রা কেউই ছিল না। তখন ওই

ঘরে। চিত্রাই ওকে প্রায় পাহারায় বসিয়ে রান্নাঘরে গেছিল। শাক্যর বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল এভাবে ওই ঘরে, একা বসে থাকতে। ও উঠতেই যাচ্ছিল তখনই পালক ঘুম আর জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে বলে উঠল।

—ও কেন বার বার আসে?

প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারেনি শাক্য। ভেবেছিল হয়ত কোনো অসুবিধা হচ্ছে। ও পালকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল,

—সম্বিতদাকে ডাকব?

—আমার যখনই মন খারাপ হয়, ও আসে কেন?

—পালকের উপর শাক্যর মনে হলো ও যেন একটা অজানা প্রদেশে ঢুকতে চলেছে। ও প্রশ্ন করতেই থাকল।

—কে আসে?

—ও কীভাবে সব বুঝতে পারে?

—কী বুঝতে পারে?

—চিত্রার বাড়িতে আর যাব না। ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে!

—কার সঙ্গে?

—আমার গান গাইতে ইচ্ছে করে। আমি যে আর গাইতে পারব না!

—কখন?

—ও কেন আমাকে...

—ও কেন আমাকে?

—খুব কষ্ট হয়।

—কী কষ্ট?

—আমি কেন শান্ত হয়ে যাই? আমার ঘুম পায়!

শাক্য এই উত্তরগুলোর জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তবু তার প্রশ্ন করে যেতে ইচ্ছে করছিল। প্রলাপ শুনবে জেনেও ওর প্রশ্ন থামতে চাইছিল না। পালক যে কাকে 'ও' বলছে বুঝতে অসুবিধে হয়নি তার। জ্বরের ঘোরে পালকের সেইদিনের প্রলাপ শাক্যকে ওর নিজের প্রায় অজানা দিক চিনিয়ে দিল! শাক্য চিনতে চাইছলি, যেতে চাইছিল সেই অজানা দেশে। সে যে আরও চিনতে চায়, নাম না জানা সেই গাহিন প্রদেশে বার বার ঢুকতে চায়। কিন্তু পালক আর কিছু বলল না, ঘুমের অতলে ডুবে গেল। অন্তত আর একবারও যদি পালক প্রলাপ বকত— শাক্যর যে বড্ড শুনতে ইচ্ছে করছিল।

।। একুশ ।।

কৃষ্ণেন্দুর এখন দম ফেলার ফুরসৎনেই। বিশেষ করে তার ফোটোগ্রাফির কোর্সটা শেষ হবার পর। যদিও কোর্সটা চলাকালীনই সে ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফি শুরু করে দিয়েছিল। এখনও তার ফ্যাকাল্টিদের সঙ্গে দারুন সম্পর্ক। এই আদেখলা সম্পর্কগুলো না বজায় রাখলে ওর উদ্দেশ্যটা শেষ পর্যন্ত গড়াবে না। এভাবেই এখন সে বহু নামি অনামি বদনামি লোকের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। খেজুরে গল্প শুনেছে বিস্তর। বহু আঁতলামি সহ্য করেছে। কিন্তু হাল ছাড়েনি কৃষ্ণেন্দু। শাক্য ওকে স্ট্রিট স্মার্ট বলে বোধহয় খুব একটা ভুল বলে না। এই গুণটা তার কর্মক্ষেত্রে ভীষণ কাজে লাগে। বহুবার ঠকেছে, কিন্তু শিখেছে তার থেকেও বেশি কৃষ্ণেন্দু ঠিক কেরই রেখেছিল। সে কোথাও ধরা বাঁধা কাজ করবে না। অন্তত তখন তো নয়ই। বিভিন্ন মিডিয়া হাউস, অ্যাড এজেন্সিতে ফ্রিল্যান্সিং করবে। এখন ওর পরিচিতির গণ্ডীটা অনেকটা বিস্তৃত, তবে বিস্তৃর্তি যতটা বিশ্বাসযোগ্যতা ততটা নয়। সে এখন কেটু ভাবনা চিন্তা করেই পা বাড়ায়। তবে মৌখিক পরিচিতির কৃত্রিম আড়ম্বরটা নিজের স্বার্থেই ধরে রাখতে হয়। কে কখন কীভাবে কাজে আসে বলা যায় না।

আজ আবীরার সঙ্গে যেতে হবে ওদেরই কলেজের এক ম্যাডামের বাড়ি। গ্রাজুয়েশান করার সময় আবীরা মাঝে মাঝে যেত উনার কাছে। ভদ্রমহিলা নাকি প্রচুর সোশাল ওয়ার্ক করেন। কৃষ্ণেন্দু মনে মনে হাসল— নেই কাজ তো খই ভাজ। এরকম সোশাল ওয়ার্ক করা অনেককেই সে ভালোভাবে চেনে। তবু কৃষ্ণেন্দু যাবে। সারারাত ধরে ফটোশপে ছবি মেরামত করেছে। দশটা থেকে বারোটার মধ্যে দুটো মিডিয়া হাউসকে সেগুলো দিয়ে, আগের অ্যাসাইনমেন্টের দক্ষিণা নিয়ে এবং অবশ্যই পরের অ্যাসইনমেন্ট ধার্য করে তিনটে নাগাদ পার্কস্ট্রিটে দেখা করবে আবীরার সঙ্গে। তাদের সম্পর্কা ঠিক সম্পূর্ণ হয়ত নয়, কিন্তু খুব রোমাঞ্চকরও কিছু নয়। শুধু আবীরার নার্সিং হোমে ভরতি হবার ঘটনাটা তাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে ভেতর

থেকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। আগে ফ্লার্ট করতে বেশ মজা পেত কৃষ্ণেন্দু। আবীরাও ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু এইদিন ওর মুখটার দিকে তাকিয়ে কী যেন একটা হারিয়ে ফেলার ভয় চেপে ধরেছিল তাকে। নার্সিং হোম থেকে ও যখন বাড়ি ফিরেছিল মা পর্যন্ত অবাক হয়ে চেয়েছিল ওর দিকে। ছেলের মুখের কোনো একটা বিধ্বস্ত অদল বদল বোধহয় মাকেও ছুঁয়ে গিয়েছিল। সেদিন ও কোনো কথা বলেনি, সোজা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। তার প্রশ্নমুখর মা একবারের জন্যও কিছু জিজ্ঞেস করেনি। রাতে শাক্যকে ফোন করার পর ও দেখেছিল মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। কাছে এসে পিঠে হাত বুলিয়ে মা শুধু বলেছিল,

—দুশ্চিন্তা করিস না। মেয়েটা ভালো হয়ে যাবে।

আবীরা নার্সিং হোম থেকে বাড়ি ফেরার পরও কৃষ্ণেন্দু গিয়েছিল দেখা করতে। ভয় লাগত ওর — মেয়েটা আবার কিছু একটা করবে না তো? ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছিল আবীরা। একদিন আবীরাই ফোন করেছিল তাকে। নিতান্ত সাধারণ নীরস কাজের কোন। কোন একটা বস্তিতে যেতে হবে ছবি তোলার জন্য। অন্য কেউ হলে কৃষ্ণেন্দু কাটিয়ে দিত। এমনটি ওই ঘটনার আগে হলে আবীরাকেও গুল তাপ্পি দিয়ে পাশ কাটিয়ে দিত। সেদিন পারল না। এরপর আবীরা যখনই ডেকেছে ও না গিয়ে থাকতে পারেনি। হঠাৎ একদিন। আবীরা ফোন করল, রাত্রি তখন দেড়টা?

—কৃষ্ণেন্দু কাল একটু দেখা করতে পারবে?

—কিছু হয়েছে?

—জানি না। তবে তোমাকে আমার কিছু জরুরি কথা বলার আছে।

—আবীরা ভালো আছে তো মধুরাদি?

—আছে মোটমুটি। দেখ কথা বলে, কী বুঝিস?

বেশ সুসজ্জিত ঘরে হাল ফ্যাশানের একটা ডিভানের ওপর আধশোয়া হয়ে বই পড়ছিল আবীরা। কৃষ্ণেন্দুকে দেখে উঠে বসল। আজকাল আর ওকে আগের মতো সে উগ্র সুন্দর মনে হয় না কৃষ্ণেন্দুর। ডিভানটার পাশে একটা গদি দেওয়া চেয়ারে বসেছিল সে। আবীরা কোনোরকম ভূমিকা না করেই বলেছিল।

—আমি, জানি, আমার সম্পর্কে তোমার কতগুলো কৌতূহল আছে। সেগুলোকে ক্ল্যারিফাই করার জন্যই ডেকেছিলাম।

—দরকার নেই আবীরা। কারণ আমার কোনো কৌতূহল নেই!

—তার মানে তুমি সব জান?

কৃষ্ণেন্দু আর কথা বাড়াতে দেয়নি আবীরাকে। চেপে ধরেছিল বুকে!

।। বাইশ।।

প্রায় দুমাস শয্যাশায়ী থাকতে হলো পালককে। কোথা দিয়ে যে কালীপূজোর ভাইফোঁটা চলে গেল! ভাইফোঁটার দিন অবশ্য সম্বিতদা এসেছিল। ছোটোবেলায় নিয়মটা ভাঙতে দেয়নি। খুব সুন্দর একটা শাড়ি নিয়ে এসেছিল। যদিও পালক শাড়িতে একেবারেই সুবিধে করতে পারে না, তবু খুব ভালো লেগেছিল তার। ওর হাতে শাড়িটা দিয়ে সম্বিতদা বলেছিল,

—এবার একটু শাড়ি পর পালক।

—তুমিও মার মতো কথা বলছ!

—বলব না?

—কেন বলবে? জিন্‌স বা সালোয়ার কী খারাপ পোষাকে?

—তা কেন হবে? বেশ ভালোইতো বেধিহয়। তবে তুই যদি একটু অ্যানালেন্টিক্যালি দেখিস, দেখবি শাড়িতে একটা মেয়ের সবকটা সস্তা খুঁজে পাওয়া যায়।

—কী ভাবে?

—যেমন ধর, শাড়ির কুঁচি—তোদের হাঁটার সঙ্গে সুন্দর একটা ছন্দ মিলিয়ে চলে। মানে একটা লুকোচুরি খেলা পায়ের পাতার সঙ্গে। তখন একটা মেয়ে কিশোরী। তারপর ধর, শাড়ির আঁচল, মানে আশ্রয়। সে তখন নারীত্বে উত্তীর্ণ! এভাবে ভাবলেই পেয়ে যাবি একটা কীভাবে একজন নারীকে নিজের মধ্যে ধরে রাখে!

—দারুন বললে কিন্তু!

—কথাটা আমার না। আমাদেরই পরিচিত একজন এভাবে একদিন বুঝিয়েছিল!

—আমারও পরিচিত?
—হ্যাঁরে! নামটা বলব?
—সেটা না বলেও বলে দিয়েছ! তাছাড়া তুমি শাড়ি নিয়ে অত ভেবেছ, ব্যাপারটা বেশ অবাক করার মতো।
—তোর অবাক হতে ভালো লাগে না?
—লাগে। তবে ছোটোবেলার কৌতূহলটা তো এখন আর নেই।
—সববয়েসেরই কৌতূহল থাকে।
—আমি বোধহয় সেভাবে ফিল করতে পারি না।
—কেন পারিস না পালক? এই যে আমরা সবাই মিলে একটা নতুন কাজ করছি, মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানর কাজ, তোর ইচ্ছে করছে না?
—আসলে ব্যাপারটা খুবই ইউটোপিয়ান লাগছে। এতটাই কি সহজ সম্বিতদা?
—না, খুব কঠিন। তাই বলে চেষ্টাও করবি না? পরীক্ষায় প্রশ্ন কঠিন আসলে সাদা খাতা জমা দিয়েছিস কখনও? না।
—ধরেনে এটাও সেরকম। ভালো নম্বর পাবি না, কিন্তু ফেলও করবি না।

সম্বিতদা চিরকালই খুব সুন্দর করে বোঝায়। যেটা বিশ্বাস করে সেটাই বলে। চাপিয়ে দেয় না কখন ও কোনো কিছু। পালককে ডাক্তার দেবাশিস গাঙ্গুলী হাঁটার অনুমতি দিয়েছেন। তবে ছমাস পায়ের ওপর জোর খাটানো চলবে না। পা মুড়ে বসা একেবারে বারণ। এখন পালককে সাবধানে, আস্তে আস্তে হাঁটতে হচ্ছে। বাবা কম্পিউটারের সামনে বসে হিসেব করছে। পালক এসে বাবার পাশে বসল। সবাই বলে ওর স্বভাবটা নাকি বাবার মতো। কিন্তু পালক জানে বাবা অনেকবেশি গভীর ও শান্ত। বাবা যেন ওকে কিছুটা হলেও নিজের মতো করে বুঝে নিতে পারে। দিদির বিয়ের পরের দিন, সবাই যখন কনে বিদায়ের আয়োজন করছিল, বাবা বাগানে কোনায় একলা দাঁড়িয়েছিল। পালক গিয়েছিল বাবাকে ডাকতে। বাবা হঠাৎই ওর মাথায় হাত রেখে বলেছিল,
—তোর খুব কষ্ট হচ্ছে, না রে?
পালক নিজেকে শক্ত রেখেই বলেছিল,
—তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা! তাই আমারও কষ্ট হচ্ছে।
—আমার কষ্টটা বোধহয় বড্ড স্বার্থপর!

পালক আর কথা বলতে দেয়নি ওর বাবাকে। সোজা ঘরে নিয়ে এসেছিল। পালক চেয়ে দেখছিল, বাবা এখন কম্পিউটারের সামনে বসে কীসব যেন হিসেবের কাজ করছে। মুখে খুব শান্ত প্রশান্তির হাসি লেগে রয়েছে। ও আস্তে আস্তে গিয়ে বাবার পাশে বসল, বাবা ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,
—পায়ের ব্যথাটা এখনও আছে রে?
—না। তবে পাটায় যেন ঠিক আগের মতো জোর পাচ্ছি না বাবা।
—ঠিক হয়ে যাবে। সব চোট শুকোতেই সময় লাগে। সেই সময়টা তো দিতে হবে।
—হয়ত। তবে এটা বোধহয় বেকায়দা হলেই ভোগাবে। ডাক্তার বলেছে পা মুড়ে ছমাস বসতে পারব না।
—বসবি না। আর বেশি স্ট্রেইনও দিবি না। সম্বিত তো সেদিনও বলে গেল!
—আচ্ছা, বাদ দেও এখন রোগের গল্প। তুমি কী করছ?
—ওই একটা হিসেবের নক্সা সাজাচ্ছিলাম। কেনরে? তুই কিছু করবি কম্পিউটারে?
—না। কিসের হিসেব বাবা?
—ওই। সেন বাবুদের ওখানে যে চ্যারিটেবল্ কাজটা হচ্ছে, সেটার। মধুরা মেয়েটা বড়ো ভালো। ওই কী সুন্দর করে আমায় সব বুঝিয়ে দিল। আসলে এইসব ভলেন্টিয়ারি সার্ভিস তো পুরোটাই প্রায় অন্যের দয়া- দাক্ষিণ্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

।। তেইশ।।

গত কয়েকমাসে অনেকগুলো ঘটনা সহ্য করেছে পালক। চিত্রাদের গৃহপ্রবেশ থেকে শুরু হল। সে জানত ওখানে শাক্য থাকবে। কিন্তু এই পরিস্থিতিটাকে এড়িয়ে যেতে পারেনি পালক। চিত্রাদের নতুন বাড়িটা খুব সন্দর হয়েছে। হয়ত সাধারণ দেখতে, কিন্তু কেমন একটা মন ভালো করা আমেজ ধরে রেখেছে বাড়িটা। ওরা এই পাড়া ছেড়ে চলে গেছে। খুব ফাঁকা লাগছিল পালকের। এখন সে ইচ্ছে করলেও নিঃশ্বাস নিতে

চিত্রাদের বাড়িতে যখন তখন চলে যেতে পারবে না। গৃহপ্রবেশের দিন যখন পালক তার মাকে নিয়ে ঢুকছিল বাড়িটাতে তখনই সামনের বাগানে বিমলকাকুর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল শাক্যকে। ওদের দেখে জিজ্ঞাস করল,

—ভালো তো?

ভাগ্যিস মা সঙ্গে ছিল। উত্তরটা মা-ই দিল,

—চলছে একরকম। তুমি ভালো আছো তো?

—হ্যাঁ কাকিমা। আপনাদের আসতে এত দেরি।

পালক ওখানে আর দাঁড়ায়নি। খেজুরে আলাপ তার কোনো কালেই ভালো লাগে না। মা তখন চালিয়ে যাচ্ছিল। সেদিন খাটুনি হয়েছিল খুব বেশি, কিন্তু অনেকদিন পর পালকের মজাও লাগছিল। আবীরা জমিয়ে দিল। যতনা কাজ করেছে, কাজ পন্ড করেছে অনেক বেশি। চিত্রা ক্ষেপে গিয়ে বলেছিল, —একটা কাজ করবি পালক?

—কী?

—এটাকে বেঁধে রাখবি?

—রাখব। কিন্তু ধারে কাছে একটাও খাটাল দেখছি না যে!

আবীরা গম্ভীর মুখে বলল,

—তোর বাড়িতেই বেঁধে রাখ না আমায়; ওখানে তো তুইও আছিস।

—মারব এক চড় শয়তান। আমার বাড়িটা খাটাল?

—তুই যখন আছিস তখন সেটা খাটল ছাড়া আর কি?

চিত্রা হাসছিল ওদের ঝগড়া দেখে। চিত্রাটা বেশ আছে। কী সুন্দর কলেজ পড়াচ্ছে। এত অল্প বয়েসে খুব কম ছেলে মেয়েই কলেজে চাকরি পায়। পালকের অবশ্য সময়মত মনে হত চিত্রার এটা প্রাপ্য। ওরা দুই ভাইবোনই পড়াশোনায় অসাধারণ। ওদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। সেটাও বোধহয় মানুষের মধ্যে একটা জেদ তৈরি করে। নিজকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জেদ। তার মতো এরকম ভেজান্যাতা হয়ে থাকতে সে কাউকে দ্যাখেনি। আবীরাও কী সুন্দর উঠে দাঁড়িয়েছে। আবার আগের মতো হয়ে গেছে মেয়েটা বা আগের থেকেও অনেকবেশি সমৃদ্ধ করেছে নিজেকে। চিত্রাদের পূজোর জায়গাটা আল্পনায় ফুল দিয়ে সাজাতে সাজাতে একটা কথা মনে হচ্ছিল পালকের। সে মোটেই আঁকতে পারেনা, আল্পনাটা চিত্রা চমৎকার দিয়েছিল। ফুলের সাজে আল্পনাটকে ঢাকতে ইচ্ছে করছিল না। আবীরার মাথায় ভূতটা বলে উঠল,

—চল, পালক এই জায়গাটা ফুল দিয়ে সাজাই।

—থাক না! আল্পনাটা ঢেকে যাবে তাহলে।

—ঢাকবে না। দিদি এভাবে সাজায়। আল্পনাটাও ঢাকে না, কিন্তু দেখতে দারুণ লাগে।

—তুই কর তাহলে।

—একা অনেক সময় লাগবে। এত কুঁড়ে হচ্ছিস না দিন দিন।

—তুই তো কর্মী।

—আগে ছিলাম না। এখন প্রাউডলি বলতে পারি রে আমি কর্মী।

—প্রাউড ফিল করলে তুই আর কর্মী হলি কীভাবে?

—শোন্ পালক আমরা কেউ মহাত্মা নই! এখন দেখ কীভবে সাজাবি।

দেখতে সত্যিই সুন্দর লাগছিল। কিন্তু ফুলগুলোকে ছিড়ে ওদের পাপড়ি দিয়ে সাময়িক সৌন্দর্যবৃদ্ধি করাটাকে সমর্থন করতে পারেনি পালক। কথাটা আবীরাকে বলাতেই বলল,

—তবেই ভেবে দেখ! একটা ফুলও মরে যাবার পর কত কিছু দ্যায়।

আবীরা তাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল যে ওরা দুজনেই উল্টে গেল। একে লিগামেন্ট ছেঁড়া পাটা নিয়ে ওভাবে মুড়ে বসা ঠিক হয়নি, তার ওপর আবীরার অতর্কিত স্নেহবর্ষণে পাটায় টান ধরল। পাশে রাখা কাঁসার দুটো রেকাবি ঝন্‌ঝন্ করে পড়ে গেল। জলের বালতিটা উল্টালো— চিত্রারা কাছেই ছিল, ছুটে এল, সম্বিতদা বলল,

—মারামারিটা কী নিয়ে?

হ্যাঁরে তোদের লাগেনি তো।

পালক উঠে বসে পড়েই দেখেছিল পাশে সিঁড়ির ল্যান্ডিং এ দাঁড়িয়ে আছে শাক্য। পালক যেন একটু জোর দিয়েই বলল,

—ধূর। কী যে বলো না কাকিমা। তোমরা এমন করছ যেন ফুলের গায়ে মূর্চ্ছা গেছি!

চিত্রা যেন হঠাৎ লক্ষ করল ওদের ফুলের আল্পনাটা।

—কী চমৎকার দেখাচ্ছেরে পালক! আবীরা ঠিকই বলেছিল এই কাজটা তুই-ই সবচেয়ে ভালো পারবি।

—আমি নয়, আমরা করেছি কাজটা।

—আবীরা হঠাৎ কোথায় হাওয়া হয়ে গেল। সম্বিতদা আল্পনাটার কাছে এসে গলাটা অস্বাভাবিক নামিয়ে বলল,

—পুরোহিতটা বড্ড ইয়ংরে। সে না ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়।

—কে? তোমার বন্ধু ডঃ দেবাশিস চক্রবর্ত্তী?

—হ্যাঁ। তোর লিগামেন্ট যাঁর হাতে! কিন্তু সে পুরোহিত জানলি কী ভাবে?

—সেটা তোমায় বলব কেন? তবে সে ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাবে না, আল্পনায় খাবি খেতে পারে।

—ও! ব্যাপারে তাহলে এতদূর!

—কতদূর।

—কেউ ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাবে কেউ আল্পনায় খাবি খেয়ে। এখন উঠে দাঁড়াতে।

—কেন? এখনও কাজটা শেষ হয়নি যে!

—দাঁড়া বলছি।

পালক উঠে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু পাটার ব্যাথা লুকোতে পারছিল না কিছুতেই! সম্বিতদা গম্ভীরভাবে বলল,

—তোকে দেবাশিস পা মুড়ে কাজ করতে বারণ করেছে না?

—হ্যাঁ।

—তবে কোন সাহসে করছিস?

—এখন তো কোনো প্রবলেম নেই। একদিন করলে কী এমন ক্ষতি হবে?

—ক্ষতিটা নিজেই টের পাচ্ছিস পালক! লিগামেন্ট ছিঁড়লে সারা জীবন ভোগায়। কথাটা আর কতবার তোকে বলতে হবে?

—আজকে টিপিক্যাল ডাক্তারের মতো বকো না তো! কিছু হবে না! স্প্রেটা আমার সঙ্গেই থাকে।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু সিঁড়ির ল্যান্ডিং থেকে স্পের করলে কী কাজ হবে? তুই বল?

—তোমার কোনো কাজ নেই না? রুগী দেখা ছাড়াও বাড়ির অনেক কাজ থাকে। আর আজকে তো তোমার সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকার কথা।

—আমি ব্যতিব্যস্ত!

সেদিন শাক্যর সঙ্গে তার একবারই কথা হয়েছিল। সেটা না হবার জন্যই নিজেকে যতটা পারা যায় দূরত্বে রেখেছিল। দুপুরের খাওয়া দাওয়া মিটলে ও একবার স্নান করল। ভীষণ গরম ছিল সেদিন। বাইরে ভেজা কাপড়গুলো মেলছিল পালক। হঠাৎই দমকা হাওয়ায় দুটোটব পড়ে গেল তার পায়ের কাছেই। পালক কাপড় মেলার তার ছেড়ে টবগুলোকে সোজা করে উঠে দাঁড়াতেই দেখল সামনে শাক্য দাঁড়িয়ে। মুখটা ভীষণ গম্ভীর। বলল,

—তুমি নিজেকে কী ভাব পালক?

পালক ভীষণ চমকে উঠেছিল। তারমানে তার সন্দেহটা ঠিক। প্রলাপের মধ্যে এমন কি সে বলেছিল যে শাক্য এই কথাগুলো বলতে পারছে। সে শুনতে চায়নি। তার ভয় করছিল। তার সম্বলটুকু ছেলেটা একটু একটু করে কেড়ে নিচ্ছে। তবে সে কী নিয়ে বাঁচবে। শাক্য তাকে পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বলে গেল,

—মনটা খারাপ করে দিলাম তো? যাও কাজে লেগে পড়, পা মুড়ে বোস, হাজার বার ওপর নীচ করো—তোমার মন খারাপ ভালো হয়ে যাবে!

পালক সত্যিই তা-ই করে যাচ্ছিল। অসহ্য রাগে মাথাটা ফেটে পড়ছিল। একটা অচেনা ছেলে তাকে এত সহজে অপমান করে গেল। অথচ একটা কথারও উত্তর দিতে পারেনি সে। আর হঠাৎ করে শাক্য এরকম করলই বা কেন? কী বলেছিল সে জ্বরের ঘোরে? নিজের ওপর রাগ হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। রাত্রে ওরা তিন

বন্ধু শুয়েছিল। ভেবেছিল খুব গল্প করবে। কিন্তু পালকের গল্প করার মানসিকতাই ছিল না। সে চিত্রাকে কথা দিয়েছিল তাই সেরাত্রে ওখানে ছিল। তাদের শুতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। একটু আধটু গল্পের মধ্যেই আবীরা আর চিত্রা ঘুমিয়ে পড়ল। সারারাত পালক প্রহর শুনেছে, কখন সকাল হবে, সে বাড়ি যাবে। ভোরের দিকে পাখির ডাক কানে আসতেই সে উঠে পড়েছিল। মোবাইলে সময়টা দেখতে গিয়ে দেখল, একটা এস.এম.এস। নম্বরটা অচেনা কিন্তু বক্তব্যটা কার সেটা বুঝতে সময় লাগেনি তার, মোবাইলের স্ক্রীনে ভেসে উঠেছিল—

''সরি! প্রথমত: তোমার কাছ থেকে নম্বরটা আমি নিজে চাইনি। এ্যান্ড ওয়ান্স এগেইন সরি ফর বিহেভিং সাচ আ ওয়ে। যদিও গান গেয়ে বললেও বক্তব্যগুলো আমার একই থাকত।''

ডিলিট করতে গিয়েও ম্যাসেজটা মুছতে পারল না পালক। একটা সময় সে অনেককিছু পেরেছে বলেই কি এখন আর পারছে না?

শাক্য এসেছে শনিবার। সোমবার ছুটি আছে। চিত্রা, সম্বিত, আবীরা, বিমলকাকু আছে ক্যানিং-এ আজ একমাস হয়ে গেল পালকটাও আসছে। ক্লাস নিচ্ছে। আজও এসেছিল। ওর ক্লাস শেষ করতে নটা বেজে গিয়েছিল। ছেলে মেয়ে গুলো চলে যাবার পর, ওখানেই কথা হচ্ছিল তাদের। যদিও পালক একটাও কথা বলেনি। মধুরাই ঘড়ি দেখে আঁতকে উঠল,

—সে কি রে। সাড়ে নটা বেজে গেছে! পালক একা ফিরবি কি করে?

—যেভাবে সবাই ফেরে।

—না না। তোকে একলা ছাড়া যাবে না।

—খুব যাবে। অতো ভেবো না মধুরাদি। আমার কিছু হবে না। আমি বরং পৌঁছে তোমায় জানিয়ে দেব।

—চল্ তোকে বাসে তুলে দিয়ে আসি। এখন অটো বা ট্যাক্সি সেফ হবে না।

—তোমরা কথা বল, আমি বাসেই যাব। গরমকালে এটা কোনো রাতই নয়। আসছি।

শাক্যই বলল,

—একমিনিট দাঁড়াও। আমি আসছি।

—বললাম তো দরকার হবে না।

—যাবে না কি মধুরাদি?

মধুরা খুব অবাক হয়ে বলল,

—এখন? কোথায় যাব?

—বাবার গাড়িটা সার্ভিসিং করিয়ে এনেছি। চলো একটা টেস্ট ড্রাইভে যাই।

—তোর লাইসেন্স আছে?

—অতটা কোরাপটেড হইনি।

গাড়িটা ভালোই চালায় শাক্য। বেশ সাবধানী ড্রাইভার। পালককে ওর বাড়ির সামনে নামিয়ে ওরা ফিরছিল। শাক্যর মুখ দেখে মনে হচ্ছে ও অনেকগুলো ঝড় ঝাপ্টা একা সামলাচ্ছে। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল বেচারাকে। শাক্য হঠাৎই বলল,

—তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে মধুরাদি। ব্যক্তিগত কথা। আজ কি আর সময় দিতে পারবে?

—পারব। কোথায় বলবি?

—তোমার ঘরে।

মধুরা ফ্রেশ হয়ে যখন ওর ঘরে ঢুকল, তখন শাক্য ছোটো সোফাটায় মাথা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকতে মায়া লাগছিল মধুরার। কিন্তু ছেলেটা বোধহয় খুবই রেস্টলেস। ওর কথা শোনাটা দরকার। নকুলদাকে বলে বাদামের শরবৎ নিয়ে মধুরা শাক্যকে ডাকল,

—একটু শরবৎ খা। ভালো লাগবে। তোকে খুব টায়ার্ড লাগছে। কী হয়েছে শাক্য?

—কারোর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করাটা অন্যায়। কিন্তু পালক কেন গান গাওয়া ছেড়ে দিল মধুরাদি?

মধুরা বেশ কিছুটা সময় নিল উত্তরটা দিতে।

—এটা বলা উচিত নয়। কিন্তু তোর বোধহয় জানাটা তার থেকেও বেশি উচিত!

—আই ডু ফিল সো।

—তোর কণিষ্ককে মনে আছে?

—কে কণিষ্ক? পাখিদির বর।

—এখন তাই। কণিষ্ক আমাদের ব্যাচমেট ছিল। পাখির প্রতি খুব কমিটেড ছিল প্রথম থেকেই। কিন্তু পাখি খুব একটা নরমাল নয়।

—সেটা জানি। দেখেছি তো কয়েকবার তোমার সঙ্গে।

—কণিষ্ক পালকদের পড়াত এবং একটা গেম খেলত। আনফরচুনেটলি আমি ওর গেমটা ধরতে পারিনি। পালককে ফাঁদে ফেলল আর ধরা পড়ল পাখি। জেলাসি তৈরি করল পাখির মধ্যে খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে। যখন পাখি আউটবার্স্ট করল, তখন বুঝিয়ে দিল পাখিকে সুস্থ করার জন্য নাকি পালকের সঙ্গে খেলাটা দরকার ছিল। অল্ বোগাস্। এটার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। পাখি রেসিপ্রকেট না করলে কনিষ্ক পালকের সঙ্গে খেলাটা খেলে যেত।

—তুমি কেন পালককে বোঝালে না?

—আনফরচুনেটলি আমিও তখন ঠিক বুঝতে পারিনি। অ্যান্ড ইউ নো, মৈনাক নামের একটা হ্যাজার্ড তখন আমাকে ঘিরে ছিল। পালক যখন টের পেল তখন আমার আর ওকে সাবধান করার কিছু ছিল না। কণিষ্কই সব বলে কয়ে নিজের রাস্তা পরিষ্কার করে নিয়েছিল। অ্যান্ড পালক ওয়াজ ডাম্পড্ লাইক আ ব্রোকেন টয়! তবু মেয়েটা কাউকে কিছু টের পেতে দেয়নি।

—পাখিদিও কিছু টের পাইনি? সেদিক থেকে দেখলে তো কণিষ্ক ওদের দু বোনকেই ঠকিয়েছে।

—বিয়ের আগে আগে আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করত পাখি— ''মধুরা পালকের সঙ্গে কণিষ্কের কিছুনেই তো?

—কী বললে?

—যা সত্যি তাই বললাম। বোঝালাম, এভাবে কষ্ট দিস না ছোটো বোনটাকে। কিছু পাখির তখন সম্পূর্ণ ব্রেন ওয়াশ হয়ে গেছে। বলল — আমি কণিষ্ককে ছাড়তে পারব না। তাছাড়া পালকের ব্যাপারটাও ওয়ান সাইডেড!

—অনেক বুঝিয়েছি শাক্য। পাখি বোঝেনি। র‍্যাদার বুঝতে চায়নি। ও যা যা করেছে তার আগে, সেগুলোকে ভুলতেই বোধহয় কণিষ্কের সো কলড্ কমিটমেন্টটাকে আঁকড়ে ধরেছিল। তারপর আমিও হাল ছেড়ে দিয়েছি এবং সেটা পালকের অনুরোধেই। যদি পাখি আবার সুইসাইডাল অ্যাটেম্ট নেয়, তাহলে ওর বাবা বাঁচবে না। সে সময় কাকুরহ একটা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়ে ছিল।

—এর সঙ্গে গান ছাড়ার কী সম্পর্ক?

—বয়সটাই এমন ছিলরে। যাকে ঘিরে ওর গীতবিতান সেই যখন ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিল, গানটাও থেমে গেল!

—এটা তো চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া!

শাক্য যখন উঠল ঘড়ির কাঁটা এগারোটার ঘরে। শাক্য দরজার কাছে যেতে হঠাৎ মধুরা বলল,

—পারবিনা শাক্য ওকে ওর গীতবিতানটা ফিরিয়ে দিতে?

—এবার পারব।

বলেই শাক্য একটা চমৎকার হাসি হাসল। মধুরার মনে হলো সম্বিতও কি পেরে গেল? রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছিল না মধুরার। সেল ফোনটা হাতে নিয়ে ডায়াল করল, সম্বিত বোধহয় একটু চমকে উঠেই বলল,

—কী ব্যাপার? সব ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ।

—তবে তো বুঝতে হবে অনেক কিছুই গোলমাল করছে।

—তোমাদের কাছ ঠিকঠাক চলছে তো?

—এতো নিশির ডাক! তবু ভালো নিশির ডাকে 'তুমি' শোনা যায়!

।। চব্বিশ।।

আজ মহা পঞ্চমী। মহালয়া থেকে মধুরাদের কমপ্লেক্সে মেলার তোর জোর শুরু হয়ে গেছে। ওদের পূজোটাও বেশ বড়ো করে হয় পাশের পার্কটাতে। পার্কটা অনেকটা বড়। এবারে পূজো কমিটির মেম্বার মধুরা,

আবীরা, শাক্য এবং আবাসনের আরও কয়েকজন। সেক্রেটারি সেন জ্যেঠু। সুতরাং তথাকথিত আমোদ উপকরণ বাদ দিয়ে মেলা বসানর প্রস্তাবটা গৃহীত হতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। যদিও চাঁদাটা বেশিই দিতে হয়েছে মেম্বারদের। রেবতী পুষ্পরাগের দেওয়া টাকাটা শেষ পর্যন্ত নিয়েছিল মধুরা। কাপড়, ওয়াল হ্যাগিং, বেডকভার, কুশান কাভার, কাপড়ের ব্যাগ। এসবের ওপর ফেব্রিকের কাজ শিখিয়েছে চিত্রা। পালক যে এতরকমের স্ন্যাকস বানাতে পারে জানতনা মধুরা। কী সামান্য সব জিনিস দিয়ে খুব কম খরচায় পাশের বস্তির মেয়ে বৌদের স্ন্যাক্স বানাতে শিখিয়েছে পালক। মেয়েটার স্বাভাবিক হতে একটু সময় লেগেছিল। শাক্য না থাকলে হয়ত ও স্বাভাবিক হতোই না। কী ভীষণ কেয়ারিং শাক্য। আজ সত্যি খুব ভালো লাগছিল মধুরার। সম্বিত আজকে আসতে পারবে না বোধহয়, আসলেও রাত হবে। চিত্রাই ওর মা-বাবাকে নিয়ে এসেছে, পালকের মাকেও ছাড়েনি। প্রথমে আসতে চাননি তনিমা কাকিমা, মধুরা আর চিত্রা জোর করেই নিয়ে এসেছে। কাকিমা বসে থাকতে পারেন না, চিত্রার মাকে নিয়ে পূজা মন্ডপের কাছে গিয়ে কীসব যেন নিয়ম আচার বোজাচ্ছেন। মধুরার ছাত্র ছাত্রীরা এখন অনেকেই এম.এস.সি পড়ছে, কারোর বিয়ে হয়ে গেছে, কেউ চাকরি করছে, আর কেউ কেউ এসব কিছু সামলেও নতুন একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে লেগে পড়েছে ডেকোরেশানে। বাবা যে কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছিল টের পায়নি মধুরা, বাবার মুখে একটা স্মিত হাসি—

—তোকে দেখে আজ সত্যি আনন্দ হচ্ছে মধুরা।

—কেন? অন্যসময় কি দুঃখ হত নাকি।

—তা একটু হত।

—কেন?

—নিজেকে কেমন আড়াল করে রাখতিস। আড়ালে থাকলে দ্যাখা যায় নারে মা। নিজেকে যত বিস্তৃত করবি তত দেখতে পাবি - জীবনটা কত বড়ো।

—বাবা জান, পাশের বস্তিটার আমরা একটা নাম দিয়েছি।

—কী?

—তটভূমি।

—বাহ। তটভূমিই তো। পলল তটভূমি। যত আবাদ করবি তত দেখবি উর্বর হচ্ছে জীবনতট। এখানে শুধুই পলি পড়ে। আরও উর্বর হয় জীবন!

—তাহলে এই নামটাই রাখি, পলল তটভূমি।

—কেন? রেবতীর দেওয়া নামটা বেশ সুন্দর তো। আমার হঠাৎ পল' কথাটা মনে হলো।

—কী করে বুঝলে নামটা মা দিয়েছে?

—তুই যেভাবে বুঝছিস সম্বিতকে।

—আবীরাও কিন্তু বুঝছে কৃষ্ণেন্দুকে, বাবা।

—একেবারে ঘরটা ফাঁকা করে চলে যাবি মা।

—এখনও বোধন হয়নি বাবা। মা সবে আসছে। ঘর তোমার ফাঁকা থাকবে না। বাবা হেসে এগিয়ে গেল পূজা মন্ডপের দিকে।